মানব জীবনে ইসলামি আকিদার প্রভাব

[বাংলা]

خصائص العقيدة الإسلامية في الحياة الإنسانية

[اللغة البنغالية]

লেখক : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

تأليف : ثناء الله نذير أحمد

সম্পাদনা : ইকবাল হোসাইন মাসুম

مراجعة : إقبال حسين معصوم

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদিআরব

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1430 – 2009

islamhouse.com

মানব জীবনে ইসলামি আকিদার প্রভাব

ইসলামি আকিদার রয়েছে এক বর্নাঢ্য ইতিহাস, যা অন্য কোনো ইজম বা বিশ্বাসের নেই। এ আকিদা ক্ষণিকের মধ্যেই ঘুরিয়ে দিয়েছে মানুষের গতিপথ, পালটে দিয়েছে তাদের জীবন যাত্রার পদ্ধতি। মুহূর্তে উন্নীত করেছে পৌত্তলিকতা থেকে একত্ববাদে, কুফর থেকে ইসলামে। মুক্ত করেছে মানুষের আনুগত্য আর দাসত্ব থেকে।
ইসলামি আকিদার মৌলিক দিকগুলো হচ্ছে : আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, রাসূল, পরকাল ও তাকদিরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস। বক্ষমান নিবন্ধে আমরা মানব জীবনে এ আকিদার প্রভাব ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব। চেষ্টা করব মুসলিম মিল্লাতের অনুসৃত আদর্শ ও তাদের জীবনে অনুশীলনকৃত আকিদার অনবদ্য ইতিহাসের সামান্য চিত্র উপস্থাপন করতে।

মুসলিম জাতির ওপর আল্লাহর অশেষ করুণা যে, তিনি তাদের মনোনীত ধর্মের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস দান করেছেন। যে কারণে এ ধর্ম ও তার আকিদা কিছু প্রতিকী আনুষ্ঠাকিতা আর ধারনা প্রসূত বিধি-বিধানে আবদ্ধ নয়, বরং ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ভর দীপ্যমান মহা এক উপাখ্যান। যার ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হবে 'মানব জীবনে ইসলামি আকিদার প্রভাব' নামক আমাদের এ প্রতিবেদন।

এ কথা আর কারো কাছে অস্পষ্ট নেই যে, মানুষ সর্ব শ্রেষ্ঠ জাতি, আবার মানুষের মধ্যে সে–ই উত্তম যে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। এ উত্তম কাজটি সম্পাদন করার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ জ্ঞান, ধর্ম, মত ও পরিসরের মধ্য থেকে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যা কখনো সফলতা বয়ে এনেছে, কখনও বা হিতে বিপরীত হয়েছে। এদিক থেকে ইসলামের কোনো জুড়ি নেই। কারণ ইসলাম মানব কল্যাণের জন্য পরিকল্পিত, নিখুঁত ও সুন্দর একটি বিধান দিয়ে নিজ অনুসারীদের ঘোষণা দিয়েছে, তোমরাই সর্ব শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের মনোনীত করা হয়েছে, মানুষের কল্যাণের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿آل عمران : 110﴾

"তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের (কল্যাণের) জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।"[১]

ইসলাম একমাত্র ধর্ম যার আদ্যপান্ত কল্যাণ আর কল্যাণ। কী ইহকালীন কী পরকালীন, কী শারীরিক কী আত্মীক, সব বিষয়ে ও সব ক্ষেত্রে তার রয়েছে মানব কল্যাণের জন্য বিশুদ্ধ আকিদা, নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা। যার মূল হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। এরই ওপর পরিচালিত হয়েছে মুসলিম মিল্লাতের প্রথম জামাত, রাসূলের পূণ্যাত্মা সাহাবিগণ। এরাই হলেন মানব ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। তারা নিজ জীবনে কুরআন ও সুন্নাহ বাস্তবায়ন করেছেন, প্রভাবিত হয়েছেন তাতে বর্ণিত আকিদা ও বিশ্বাসে। তাই মানবীয় জীবনে ইসলামি আকিদার প্রভাব প্রত্যক্ষ করার জন্য উম্মতের প্রথম প্রজন্ম বিশেষভাবে প্রথম ব্যক্তির জীবনাচার ও কর্মধারা নিয়ে পর্যালোচনা করাই যথেষ্ট হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।
তওহিদ : এটি ইসলামি আকিদার মূল ভিত্তির একটি। ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, মানব জীবনে সব চেয়ে বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী হচ্ছে এ তওহিদ। এ আকিদা গ্রহণকারী একজন

[১] আলে-ইমরান : ১১০

মানুষ যে পরিমান ত্যাগ ও কঠিন কর্ম সম্পাদন করতে পারে, তা এ আকিদাশূণ্য অন্যকারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, তাওহিদের প্রভাব সে ব্যক্তির মধ্যেই বিকশিত হবে, যে একে আলিঙ্গন করবে এবং এর রঙে রঙিন হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি ব্যাটারী বিদ্যুৎ থেকে যে পরিমাণ চার্জ সংগ্রহ ও ধারণ করতে পারবে, সে সে পরিমাণ-ই দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারবে। এটাই খাটি তওহিদে বিশ্বাসী একজন পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তির উদাহরণ; যে ইসালামি আকিদা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এবং প্রানবন্তভাবে নিজ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়। সেই হচ্ছে শাশ্বত দিক্ষায় দীক্ষিত প্রকৃত মুসলমান।

ইসলাম তার প্রথম যুগের অনুসারীদের দ্বারা যে দৃষ্টান্ত পেশ করেছে, তা সমগ্র মানব ইতিহাসে বিরল ও দুর্লভ। যা শুধু আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী কিংবা এদের মত উজ্জ্বল কতক নক্ষত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, যদিও তারা গৌরবময় মানব ইতিহাসের মধ্যমণি। তদুপরি তারা ছাড়াও হাজার ব্যক্তি ও উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। ইতিহাস যাদের উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করতে অক্ষম–অপরাগ। বোধ করি এ কারণেই ঐতিহাসিকগণ এ জাতির সমৃদ্ধ ইতিহাস আদ্যপান্ত লিপিবদ্ধ করার পরিবর্তে শুধু ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে এক পর্বে থেকে অন্য পর্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে এ আকিদার উর্বর ভূমি থেকে এ ধরনের অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত বিকশিত হওয়া স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছিল। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :

- একজন মুজাহিদ যিনি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য নিজ হাতে বিদ্যমান কয়েকটি খেজুর এ বলে ফেলে দিয়েছিলেন, 'এগুলো খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমার জন্য দীর্ঘ জীবনের আশা করা বৈকি'। অতঃপর তা নিক্ষেপ করে শাহাদাতের অদম্য স্পৃহায় যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েন, একপর্যায়ে শাহাদাতের স্বর্গীয় সুধা পান করে পার্থিব জীবনের ইতি টানেন।
- আরো উল্লেখ করা যায় সে যানবাজ লড়াকুর কথা যিনি পারস্যের মোকাবিলায় জিহাদের জন্য বর্ম পরিধান করেন, অন্য সাথীরা বর্মে ছিদ্র দেখে সাবধান করে তা পালটাতে বললেন। উত্তরে তিনি হেসে বলে উঠলেন, এ ছিদ্র জনিত আঘাতে মারা গেলে অবশ্যই আমি আল্লাহর কাছে আদৃত হব। এরপর বিলম্ব না করে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়লেন। সে ছিদ্র দিয়ে হঠাৎ আঘাত হানে একটি তীর, ফলে সহাস্যবদনে সেখানেই তিনি শাহাদাতকে আলিঙ্গন করেন। শাহাদাতের স্বতঃস্ফুর্ত আলিঙ্গনে এভাবেই তিনি আল্লাহর পানে ছুটে চলেন।
- উল্লেখ করা যায় মেহমানদারির নজিরবিহীন সে ঘটনার কথা, যার বর্ণনা পবিত্র কুরআনেও উদ্ধৃত হয়েছে। যাদের সংগ্রহে ছিল সামান্য কিছু খেজুর। রাতে হঠাৎ মেহমান এসে হাজির হয়। মেহমানসহ খেতে বসে বাতি নিভিয়ে দেন আর মিছে মুখ নেড়ে খাওয়ার ভান করে যান। এদিকে তারাও খাচ্ছেন ভেবে মেহমান তৃপ্তিসহকারে খেতে থাকেন। এভাবেই নিজেরা না খেয়ে মেহমানকে খাওয়ানোর মত উদারতা প্রদর্শন করেন। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿الحشر:9﴾

"আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালবাসে। আর মুহাজরিদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।"[২]

মানব কল্যাণ, পরার্থপরতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিবিধ ক্ষেত্রে এরূপ অনেক নজির রয়েছে, যা অন্য আকিদায় বিশ্বাসী কোন মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়না। ইতিহাস এমন নজির গড়তে ব্যর্থ হয়েছে বারবার।

[২] হাশর : ৯

এ পর্যায়ে আমরা মুসলিম উম্মাহর জীবন থেকে নেয়া কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে এ আকিদার প্রভাব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রসঙ্গত: যারা একে প্রত্যাক্ষান করেছে, তারাও যে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সে ব্যাপারেও কিছু উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

১. ইসলামি আকিদার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে, আল্লাহ ভীতি ও কিয়ামত দিবসের বিশ্বাস। এর ফলে স্বেচ্ছাচারীতা বন্ধ হয়, সর্বক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিজ দায়িত্ববোধ সদা জাগ্রত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ওমর রা.–এর কথা উল্লেখ করতে পারি, তিনি ছিলেন খলিফাতুল মুসলিমিন। রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত দায়িত্বশীল। তিনি আল্লাহ ভীতি ও নিজ দায়িত্ববোধ থেকে বলেছিলেন, "ইয়ামানের সানআতেও যদি কোন গাধার পা পিছলে যায়, তাহলে সে ব্যাপারে আমিই দায়ী, কেন তার রাস্তা সমতল করে দেইনি।"

২. এ আকিদায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে তারা নিজ জান ও মালের মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদর যে নমুনা পেশ করেছেন, তার দৃষ্টান্তও বিরল। এর ওপর নির্ভর করেই জগৎ সংসারে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সামান্য অস্ত্র ও সীমিত জনবল দিয়েই বিপুল অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত, দ্বিগুন–তিনগুন বেশী শত্রু বাহিনীর মোকাবিলায় অবিশ্বাস্য বিজয় অর্জন করেছেন।

৩. এ আকিদায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছেন, তারই সুবাদে এক সময় এ বসুন্ধরার সর্বত্র নিরাপত্তাময় পরিবেশ বিরাজমান ছিল।

৪. সামাজিক নিরাপত্তামূলক তহবিল গঠন। এ আকিদায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে তারা সামাজিক নিরাপত্তা মূলক তহবিল গঠন করেছেন। যার ফলে পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে। ঐক্য ও সম্মিলিত শক্তি বিনষ্টকারী মানবিক ব্যাধি হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব হয়েছে। পরার্থপরতা ও সহমর্মিতার সুবাতাস বয়ে বেড়ায়েছে পুরো ইসলামি সমাজে। যা আমরা বর্তমানে প্রত্যক্ষ করি বিভিন্ন কল্যাণ মূলক কাজের জন্য ওয়াকফকৃত দান–অনুদানের ভেতরে।

৫. পারস্পরিক চুক্তির যথাযথ সংরক্ষণ। মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে যতটুকু এগিয়ে পূর্ণ মানব ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই ।

৬. ধরাপৃষ্ঠে ইনসাফের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। যা কোন জাতির ইতিহাসে বিদ্যমান নেই। তারা স্বজনপ্রীতি ও সর্বপ্রকার স্বার্থের উর্দ্ধে থেকে গরীব-ধনী, ছোট-বড়, মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে যে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাস আজো পর্যন্ত পেশ করতে পারেনি।

৭. ইসলামি রাষ্ট্রের অধীন অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার হেফাজত। তারা অমুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক যে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন, তার নজির খোদ অমুসলিম রাষ্ট্রেও অনুপস্থিত।

৮. ইসলামি সমাজের আদর্শ ও ভাবমূর্তির যথাযথ সংরক্ষণ। ইসলামি সমাজে মাদকদ্রব্য, অনৈতিক কার্যকলাপের কোন প্রশ্রয় নেই। যে কারণে ইতিহাস সাক্ষ্য দিতে বাধ্য, মুসলিম সমাজে অন্য যে কোন সমাজের তুলনায় অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার উপস্থিতি ছিল একেবারেই গৌন। নীতি–নৈতিকতা বিবর্জিত বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্ব যে সব মরণ ব্যাধি, যেমন এইডস, গণরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদিতে আক্রান্ত, তার সিকি ভাগও মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নেই। যদি কোথাও তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তাও তাদের অনুসরণে অভ্যস্ত, তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত পরিবার ও সমাজে সীমাবদ্ধ। নিকট অতীতেও যারা ইসলামের অনুসরণ করেছে, তাদের মধ্যে মানবিক অধিকার ও সম্মান নিরাপদ ছিল। তবে ইদানিং কতিপয় লোক ও গোষ্ঠি ইসলামের অনুসরণ ত্যাগ করে, আধুনিকতা ও প্রগতির নামে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ করছে, আর তাদের মধ্যেই লক্ষিত হচ্ছে পশ্চিমাদের সে অশ্লীলতা ও মরণ ব্যাধি এইডসসহ নানা মারাত্মক রোগ।

৯. ইসলামি আকিদায় বিশ্বাসী মুসলিম জাতির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচাঞ্চল্যতার বৃদ্ধি ঘটে। যার প্রমাণ ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় স্বল্পতম সময়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রসার। সঙ্গে সঙ্গে আরবি ভাষারও বিস্তার।

১০. ইসলামি আকিদায় বিশ্বাসী জাতির মধ্যে জ্ঞান আহরণ প্রবনতা বৃদ্ধি পায়। যার প্রমাণ মুসলিম জাতির কুরআন ও হাদিসের ব্যাপক চর্চা। আরো প্রমাণ, তাদের বিজ্ঞানকে থিওরিগত বিদ্যা থেকে বের করে বাস্তব ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ বিদ্যায় রূপান্তর করণ। তাদের আবিষ্কার ছিল বাস্তবভিত্তিক, বস্তুনিষ্ঠ ও প্রমাণিত। ব্যক্তি ও দার্শনিকদের নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

১১. এ আকিদার ফলে বিশ্বব্যাপী ইসলামি সভ্যতার আন্দোলন ঘটে। যে আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক ও আত্মিক সাধনার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো। ইহকাল ও পরকালের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করা।
১২. বিশ্বময় দেশ ও জাতির মধ্যে ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করা। যার মূলভিত্তি ছিল এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস। তার মধ্যে ছিল না কোন ভাষা, বংশ ও জাতির বিবাদ−ভেদাভেদ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিচরণ করেছে, তাতে ছিল না কোন বাধা, ভিসা কিংবা নিরাপত্তার নামে অন্য কোন হয়রানি। তাদের মধ্যে ছিল না কোন পরদেশির ভাবনা। অথচ তাদের সরকার ভিন্ন, দেশ ভিন্ন। আবার কোন কোন দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধ থাকলেও এক আকিদার ফলে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অটুট ছিল।

এ হলো ইসলামি আকিদায় গঠিত ও এর রঙে রঙ্গিন মুসলিম জাতির বর্ণীল ইতিহাস। ইসলামি সমাজের সামান্য নমুনা। সংক্ষেপে বলতে পারি, এ আকিদার দ্বারা এমন একটি জাতি তৈরি হয়, যারা হয় বিশ্বস্ত −আমানতদার, সৎ-নীতিবান, আল্লাহ ভীরু ও মানবতার কল্যাণকামী। আরো একটু ব্যাপক করে বলা যায়, তারা আল্লাহর খাঁটি আবেদ−আনুগত্যশীল, তারা নিজ কর্ম, চিন্তা, চেতনা, বোধ ও অনুভুতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণকারী। পূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে উচ্চারণ করে,

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿االأنعام: 162-163﴾

'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ আলাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব, তাঁর কোনো শরিক নেই।'[৩]

যে ব্যক্তি জাগতিক চাহিদার ওপর নিজ নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে স্বক্ষম; প্রতিমা ও দেবদেবীর পূজা-অর্চনা ত্যাগ করে আল্লার এবাদত−আনুগত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে স্বক্ষম; স্বীয় চাল-চলন, চিন্তা-গবেষণা ও পার্থিব জগতের উন্নয়নে বোধ-বুদ্ধির ভারসাম্য রক্ষায় যত্নশীল, একমাত্র সেই পারে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে পাথেয় বানাতে।

অমুসলিমদের ওপর ইসলামি আকিদার প্রভাব :

যারা ইসলামি আকিদা গ্রহণ করেনি। বরং এর বিরোধিতা করেছে সর্বোতভাবে, ক্রুসেডসহ অন্যান্য যুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর বারবার পৈশাচিক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে নির্মমভাবে, সেই পশ্চিমা গোষ্ঠির ইসলাম ও মুসলমান থেকে শিক্ষণীয় কিছু বিষয় উল্লেখ করছি।
মধ্যযুগের পতনোম্মুখ ইউরোপ আর্ন্তজাতিক নিয়ম-নীতি সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মানুষের অন্তর ও আত্মায় ক্ষমতাসীন রাজত্বের প্রভাব ও মহিমা ধরে রাখতে সরকার ও পুরোহিতগণ গলদঘর্ম হচ্ছিল অহর্নিস। রাজ্যগুলো ছিল প্রদেশ কেন্দ্রিক, খণ্ড-খণ্ড। নিজেদের মাঝে ছিল না কোন মিলন সূত্র। অথচ সম্পূর্ণটাই ছিল খৃষ্টরাজ্য। কারণ প্রাদেশিক সরকার নিজ রাজত্বে স্বতন্ত্রভাবে রাষ্ট্রীয় ও বিচার-বিভাগীয় আইন প্রনয়ন ও বাস্তবায়নসহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল।
আরেকটি বাস্তবাতা হচ্ছে, পোপতন্ত্রের ক্ষমতা ও দাপটের যাঁতাকলে মানুষের অন্তরাত্মা, চিন্তা-চেতনা পিষ্ট ছিল। অবৈধভাবে মানুষের শ্রম ও সম্পদ কুখ্যিগত করে রেখেছিল তারা। পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿التوبة:34﴾

"হে ঈমানদারগণ, অধিকাংশ পোপ ও পুরোহিতগণ অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে, আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে। যারা স্বর্ণ-রোপা পুঞ্জিভুত করে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন।"[৪]

---

[৩] সূরা আনআম : ১৬২-১৬৩

এরই মধ্যে তাদের সুযোগ হয় ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে সরাসরি দেখা-সাক্ষাতের ও আদান-প্রদানের। কখনো সন্ধিচুক্তির ফলে, যেমন মুসলিম স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, সিসিল দ্বীপ ও অন্যান্য দেশের সাথে। আবার কখনো যুদ্ধের ফলে, যেমন ক্রুসেড। এ ধরনের শান্তিচুক্তি ও যুদ্ধের ফলে ইউরোপ ইসলামের সংস্পর্শে আশার সুযোগ লাভ করে। তাদের আরো সুযোগ হয় ইসলাম সম্পর্কে জানার ও পর্যালোচনা করার। তারা কিভাবে ইসলাম সম্পর্কে জেনেছে ও ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি :

১. ইসলামের সংস্পর্শে এসে ইউরোপ ইসলাম সম্পর্কে পুর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করে। তারা স্বয়ং সাইন্টেফিক গবেষণায় ইসলামের প্রায়োগিক পদ্ধতি উদ্ভাবন ও অবলম্বন করে। তার ওপর ভিত্তি করেই তাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতা।

২. তারা ইউরোপকে এক ও ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য ইসলামি খেলাফত পদ্ধতি অবলম্বন করে। কারণ তারা লক্ষ্য করেছে ইসলামের খেলাফত পদ্ধতির দ্বারাই পুরো মুসলিম বিশ্ব এক ও অভিন্নভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তবে সেটি সঠিক বিশ্বাস ও নির্ভুল আকিদার উপর নির্ভরশীল নয় বলে তারা সফলতা পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি। কারণ তাদের আকিদা ভ্রান্ত এবং তাদের পুরোহিতরাও ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত। ফলে তারা পুরো ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য জাতীয়তাবাদকে প্রধান্য দেয় এবং ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে একেই বেছে নেয়। আজ পর্যন্ত সে জাতিয়তাবাদের ভিত্তিতেই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমুহ পরিচালিত হচ্ছে। মূলতঃ তারা এ নীতিও ইসলাম থেকে শিখেছে।

৩. কালফন, মার্টিন লুসার ও অন্যান্য ব্যক্তিরা ইসলামের স্পর্শে এসে নিজদের মধ্যে বিদ্যমান আকিদাগত ও গীর্জার ভ্রান্তিগুলো দূর করতে সচেষ্ট হয়। এ জন্য বিভিন্ন আন্দোলনেরও সূচনা করে। তবে তাদের মধ্যে বিদ্যমান ভারসাম্যহীনতা ও অশ্লীলতার কারণে সফলতা খুব বেশি একটা দেখা যায়নি। কারণ সংস্কার ও সংশোধনের সঠিক পথ ইসলামকে তারা গ্রহণ করেনি।

৪. ইসলামের স্পর্শে এসে তারা ইসলামি বিদ্যাপিঠগুলোর নিয়ম-পদ্ধতি ও সিলেবাস রপ্ত করে এবং সে অনুসারে নিজদের শিক্ষাঙ্গনে সংস্কার এনে সেখানে ইসলামি পদ্ধতির বাস্তবায়ন করেন।

৫. তারা মুসলমানদের বিচক্ষণতা, দুঃসাহসিকতা ও সাহসী অভিযান প্রত্যক্ষ করে নিজেদেরকে সে ভাবে গড়তে শুরু করে। সাথে সাথে মুসলমানদের ন্যায় অশ্বারোহন বিদ্যা শিক্ষা করে নিজেদের মাঝে তার বাস্ত বায়নও ঘটায়।

৬. 'কুরআনুল কারিম' মুসলমানদের সংবিধান। এটা আল্লাহর বাণী এবং তার অনুমোদিত একমাত্র বিধান। এতে কোন ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষা করা হয়নি, বরং এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সবার স্বার্থ ও কল্যাণকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। তারা এ কুরআনের পদ্ধতি থেকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সংবিধান রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যা আজ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিদ্যমান। তারা মালেকি ফিকাহ থেকে নগর উন্নয়নের অনেক নীতি-ই গ্রহণ করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ফ্রান্স। ফ্রান্সের নগর উন্নয়নের অধিকাংশ নীতি ও নিয়ম গ্রহণ করা হয়েছে মালেকি ফিকাহ থেকে। কারণ উত্তর আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রসারিত মালেকি মাজহাব-ই তাদের সব চেয়ে কাছের কোন ইসলামি বিধান ছিল।

৭. তারা ইসলামি নির্মাণ কৌশল ও স্থাপত্বশৈলী দ্বারা প্রভাবিত হয় ব্যাপকভাবে। তাইতো ধর্মীয় ও সাধারণ প্রাসাদসমূহে ইসলামের নির্মাণ কৌশল অনুপুঙ্খ অনুসরণ করে। তারা ইসলামের নিখুঁত পদ্ধতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। ক্ষুদ্র একটি উদাহরণ : ঘরের সঙ্গে বাথরুম নির্মাণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করা। মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার পূর্বে ইউরোপে এ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না।

৮. ভৌগলিক রূপরেখা প্রণয়নেও তারা ইসলাম থেকে উপকৃত হয়েছে। ইসলামি মানচিত্র দেখে সে অনুপাতে নিজেরা নিজেদের মানচিত্র প্রণয়ন করে এবং তার মধ্যে ব্যাপক উন্নতি সাধনে ভূমিকা রাখে।

[8] তওবা : ৩৪

মুদ্দা কথা, ইউরোপ তার বর্তমান প্রগতি ও উন্নতির মূল রসদ গ্রহণ করেছে ইসলাম থেকে। যদিও বর্তমান যুগে এসে ইসলাম ও মুসলমানের প্রভাব তাদের মধ্যে বলতে গেলে নেই। তারা স্বার্থান্ধাত্যায় ইসলামকে দূরে নিক্ষেপ করেছে।

একটি প্রশ্ন : বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে কিংবা তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে এর কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তাহলে কী ইসলামি আকিদা স্বীয় ঐতিহ্য ও কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলল?

উত্তর : কস্মিন কালেও না। ইসলাম কোন অংশেই তার কর্ম ক্ষমতা ও কার্যকারিতা হারায়নি। কারণ ইসলাম সবসময়ের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত মানব জাতির চিরন্তন জীবন বিধান। একমাত্র এর মাধ্যমেই মানব জাতি সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে এবং রাখতে পারে প্রতি পদে সাফল্যের শাশ্বত স্বাক্ষর।

তবে মূল ব্যাপার হল: এটি তখই কাজ করবে মানুষ যখন কায়মনো বাক্যে এ আকিদর বাস্তবায়ন করবে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿الرعد:11﴾

"আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"[৫]

এ হল আল্লাহর বিধান, যার কোন পরিবর্তন নেই। প্রচেষ্টা ব্যতীত এবং উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা ছাড়া কখনো মানুষের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। মানুষের জীবন অধ্যায় পরিচালনার জন্য ইসলামি আকিদার ন্যায় সফল অন্যকোন চালিকা শক্তি নেই। কিন্তু সে তাকে-ই পরিচালনা করবে যে, ইসলামকে আন্ত রিকভাবে গ্রহণ করবে, তার প্রতি মনোনিবেশন করবে এবং বাস্তব জীবনে তার বাস্তবায়ন কল্পে জীবন-মরণ পণ করবে।

উদাহরণত: বিদ্যুৎ উপাদন কেন্দ্র। সর্বদাই সে সক্রিয় কিন্তু যদি কোন সংযোগ দানকারী না থাকে, তবে কি উপকারে আসবে ?

অথবা মনে করুন সে সক্রিয়। কিন্তু কেউ যদি তার থেকে শক্তি সঞ্চয় না করে তবে কি লাভ হবে? আমরা কি বলব– বিদ্যুৎ প্রভাব শূন্য হয়ে গেছে ? না-কি বলব– মানুষ তার ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে ?

এ হলো ইসলামি আকিদার উদাহরণ। আর সেসব মুসলমানদের উদাহরণ যারা নামে মাত্র ইসলামের অনুসরণ করে। যে ইসলাম দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণের বাহক তারা সে ইসলামকে প্রয়োগ করে না, তার প্রতি ধাবিত হয় না। ফলে তাদের জীবন পতনোন্মুখ। আবার কখনো এর থেকে উত্তরণের চিন্তা করলেও সত্যিকারার্থে ত্রানকর্তার দিকে দৃষ্টি দেয় না। বরং যে পতন ত্বরান্বিত ও গভীর করবে, তার প্রতি-ই ধাবিত হয়।

মুসলমানের সময় এসেছে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের এবং তার মনোনীত ইসলামের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের। তাদের সময় এসেছে বাস্তব ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করার। শয়তান আছরকৃত ব্যক্তির ন্যায় এদিক-সেদিক ঘুরা-ফিরা ছেড়ে, ইসলাম থেকেই জীবনের সঠিক রূপ–রেখা গ্রহণ করা। যার উপর নির্ভর করে এগুবে অভীষ্টলক্ষ পানে।

তবে মুসলিম যুবকদের ভেতর ইসলামি পুনঃজাগরণের যে আন্দোলন দুনিয়া-জুড়ে বিরাজ করছে, অদূর ভবিষ্যতের জন্য এটি একটি শুভ সংবাদ। যদিও এ ভবিষ্যত প্রচুর ত্যাগ-তিতিক্ষা আর কুরবানির দাবিদার। তবে যারা দ্বীন পরিত্যাগ করেছে কিংবা দ্বীন থেকে নিজকে চিরতরে মুক্ত করে নিয়েছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। বরং তাদের উপর প্রয়োগ হবে আল্লাহর অশনি সংকেত,

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿محمد:38﴾

"যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতির সৃষ্টি করবেন যারা তোমাদের মত হবে না।"[৬]

---

[৫] সুরায়ে রাদ : ১১

পক্ষান্তরে যারা এ দ্বীন আকড়ে আছে, এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, তারা অতি সত্বর আল্লাহর ওয়াদা প্রত্যক্ষ করবে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿النور:55﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীর শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।"[৭]

সমাপ্ত

[৬] মুহাম্মাদ : ৩৮

[৭] নূর : ৫৫